যুগান্তর

14 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক নিয়ে জটিলতা

শিক্ষা

প্রতি বছরই স্কুলে নতুন বছরে শিক্ষাক্রম শুরুর আগে এনসিটিবি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগে দেশের সব স্কুলেই সমশ্রেণীর প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যেত। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্কুলের সব শ্রেণীর পরীক্ষা শেষে প্রোগ্রেস রিপোর্ট ও পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থের একটা তালিকা দেয়া হতো। শিক্ষার্থীরা ডিসেম্বরের দু'সপ্তাহ ছুটির মধ্যে নতুন পাঠ্যপুস্তক কিনে টেবিলে সাজিয়ে রেখে প্রতিদিন বই খুলে খুলে দেখত। ভালো শিক্ষার্থীরা অংক, বীজগণিত ও জ্যামিতির বই দেখে নিজেরাই কিছু কাজ এগিয়ে নিত। নতুন বই, নতুন ক্লাস ছিল অভিন্ন সূত্রে গাঁথা। অনেক শিক্ষার্থীর ওপরের ক্লাসের ভাই-বোন থাকলে তাদের কাছ থেকে তারা ব্যবহৃত বই সংগ্রহ করে নিত। জানুয়ারিতে স্কুলে ক্লাস শুরু হলে নতুন বা পুরনো ব্যাগে বই ভরে নিয়ে স্কুলে যেত মনের আনন্দে।

আগে স্কুলে পাঠ্যবই পেতে ও স্কুলে পাঠ্যবই নির্বাচন করতে খুব কষ্ট পেতে হতো না। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে উভয় বিষয়ের র‍্যাপিড রিডার মুদ্রণ ছাড়া অবশিষ্ট বই প্রকাশ করতেন প্রকাশকরা। তখন প্রকাশকের সংখ্যা কম ছিল বলে পরিচিত প্রকাশকরা অন্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ করার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করে নিজেদের স্কুলের জন্য গ্রন্থ নির্বাচন করতেন।

গ্রন্থ নির্বাচনে বিষয় অভিজ্ঞ স্কুলশিক্ষকরা প্রধান শিক্ষককে সহায়তা করতেন। বিভিন্ন স্কুলে একই বিষয়ের বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ নির্বাচন করলেও পাঠদানে কোন অসুবিধা হতো না। কারণ, স্কুল বোর্ডের নির্দেশমতো বিভিন্ন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হতো। নিজেদের প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠ্যতালিকা ভুক্তিতে প্রকাশকরা বই বিভিন্ন স্কুলে জমা দেয়ার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামতো বই নির্বাচন করতেন। স্কুল ছাড়া একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে একই প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রেও ইংরেজি ও বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ ছাড়া বিভিন্ন কলেজ খ্যাতিমান লেখকদের বই নির্বাচন করত। স্কুল ও কলেজ পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশনা, নির্বাচন ও কেনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা যায়নি বলে শিক্ষার্থীরা ওপরের ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সিলেবাস থেকে বই সংগ্রহ বা কিনে নিত। এখানে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হল : স্বাধীনতা-পূর্বকালীন সময়ে স্কুল ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক কম ছিল বলে পাঠ্যবই প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দেয়নি। এই যুক্তি অর্ধেক প্রকৃত এজন্য যে, স্বাধীনতার পর স্কুল-কলেজের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পাশাপাশি দেশে প্রকাশনা শিল্পেরও স্ফীতি ঘটেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে পাঠ্যপুস্তক সংস্থার লোকবল এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি। আগের হ্যান্ড কম্পোজ বহু আগেই বাতিল হওয়ার পর মেশিনে মনো ও লাইনো কম্পোজের পর সাম্প্রতিককালে কম্পিউটার কম্পোজ প্রকাশনা ও তার সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করেছে। আগে স্কুল বোর্ডের অফিস ছিল ছোট বাড়ির মতো, আর বর্তমানে এনসিটিবির বিল্ডিং হয়েছে বারো তলা বা তার বেশি। পুরনো ভবনের পাশে আর একটি নতুন ভবনও নির্মিত হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে জনবলও।

বর্তমানে স্কুল পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশনা ও বিপণনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা শুধু পুরনোই নয়, নতুনভাবে বিচার ও সমস্যা উত্তরণের দিক উদ্ভাবনও একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই ত্রি-স্তরীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রকাশনা ও বিতরণের দায়িত্ব এনসিটিবির। তিন পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনায় বোর্ড নিজেরাই লেখক, সম্পাদক ও চিত্রশিল্পী নির্বাচন করে থাকেন। লেখক নির্বাচন করা হয় দ্বিবিধ প্রক্রিয়ায়— প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। বোর্ড অধিকাংশ গ্রন্থের লেখক নির্বাচন করে প্রত্যক্ষভাবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে। বাধ্যতামূলক পাঠ্যগ্রন্থের লেখক এভাবে নির্বাচিত হলেও নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের র‍্যাপিড রিডার নির্বাচনের সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় এবং বিভিন্ন লেখক বিবেচনার জন্য নিজেদের পাণ্ডুলিপি বোর্ডে জমা দেন। অনেক সময় একাধিক লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে লেখা নিয়ে মূল পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, অপরিচিত লেখক এককভাবে জয়ী হন অথবা তাদের আংশিক পাণ্ডুলিপিও গৃহীত হয়। এই শ্রেণীর পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের দায়িত্ব বিশেষ অফিসারের ওপর থাকে বলে অনেক সময় নিজেরা ছদ্মনামে অথবা

নিকটাত্মীয়ের নামে পাণ্ডুলিপি জমা দেন বলে অতীতে অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। মূল পাঠ্যগ্রন্থ লেখার দায়িত্বে যেসব লেখক থাকেন, তাদের পাণ্ডুলিপি একাধিক স্তরে বিবেচনার পর গ্রহণ করা হয়।

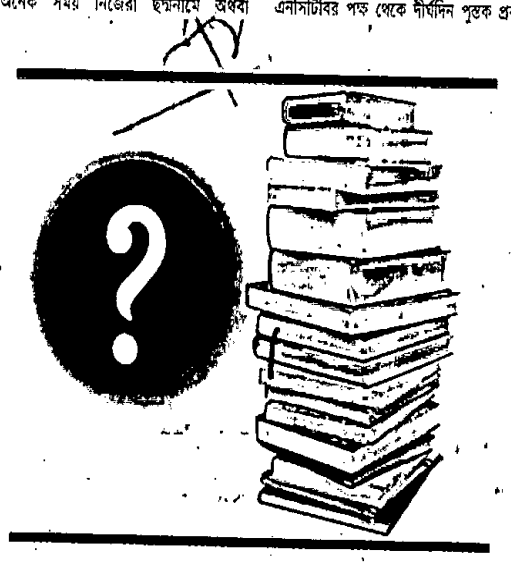

পাণ্ডুলিপি নির্বাচনের দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় শিল্পীদের মাধ্যমে চিত্র তৈরির পর প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা হয়। এই পর্যায়ে বোর্ড গ্রন্থ প্রকাশের পর বিভিন্ন প্রকাশককে দায়িত্বভার অর্পণ করে বাংলাদেশের সর্বত্র বিতরণের জন্য। এই পর্যায়েই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। বোর্ডের পক্ষে অনেক সময় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে বেশি সময় লাগে বলে ঠিক সময়ে মুদ্রণ ও বিতরণ সম্ভব হয় না। প্রকাশনা ও বিতরণের সময় দেখা যায়, যে কাগজে গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়ার কথা, তার চেয়ে নিম্নমানের কাগজে মুদ্রিত হয়েছে এবং ঠিক সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছায়নি। অনেক সময়, দ্রুত মুদ্রণের কারণে বানানগত ত্রুটি ছাড়াও বিষয়গত ত্রুটিও দেখা দেয়। তা ছাড়া, নিম্নমাধ্যমিক শ্রেণীর গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা থাকলেও শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে না পেয়ে মূল্য দিয়ে দোকান থেকে কিনতে বাধ্য হয়। শিক্ষার্থীদের স্কুলে ক্লাস শুরু হওয়ার সময় বই না পাওয়া ছাড়াও অন্য একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যেসব পুস্তক বিক্রেতা বই বিক্রি করেন তারা নোটবই না কিনলে মূল বই বিক্রি করতে অনীহা প্রকাশ করেন বলে শিক্ষার্থীরা নোটবই কিনতে বাধ্য হয়। নোটবই প্রকাশে বেশি লাভবান হয় বিশেষ একশ্রেণীর প্রকাশক সম্প্রদায়। তাদের পক্ষ থেকে দ্রুত নোটবই প্রকাশ করে বাজারজাত করা ছাড়াও গ্রন্থ বিক্রেতাদের বেশি পরিমাণে কনসেশন দেয়া হয় বলে তারাও নোটবই বিক্রির ক্ষেত্রে অধিকতর লাভবান হন। নোট বইয়ের গুণাগুণ বিচার করলে দেখা যাবে, প্রকাশকরা বেশি মুনাফার জন্য অনেক সময় অনুপযুক্ত লোকদের দিয়ে নোটবই লিখিয়ে প্রকাশ করেন। অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা মূল বই না কিনে শুধু নোটবই কিনে থাকে বলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে না।

এনসিটিবির পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন পুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণে অব্যবস্থা সম্পর্কে পুঞ্জীভূত অভিযোগ দূর করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এই শ্রেণীর অব্যবস্থা যে সব সময় বর্তমান ছিল তা নয়, তবে সমস্যা নিরসনের চেষ্টার কথা প্রকাশিত হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তার ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষেও পাঠ্যগ্রন্থ ঠিক সময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছবে কিনা এ ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংস্থার অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ দিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বিরাজমান অব্যবস্থা দূর করা সম্ভাব্য দিকে নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

এনসিটিবির প্রাথমিক কাঠামো গ্রন্থ প্রকাশ ও বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে খানিকটা জড়িত। এই শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যত্র থেকে চেয়ারম্যান ও অনেক অফিসার প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। বিশেষত, উচ্চপদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলেও চেয়ারম্যান পদে এমন একজনকে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন যিনি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিপণন ব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী এবং নিরপেক্ষভাবে কাজ করার অধিকারী। পাণ্ডুলিপি গ্রহণ ও প্রকাশের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সার্বক্ষণিকভাবে এই পদে নিয়োজিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা ছাড়া, প্রকাশকদের ও মুদ্রণকারীদের সঙ্গে সংস্থার একটা সুষ্ঠু সম্পর্ক গড়ে ওঠে— সেই শ্রেণীর নীতি গ্রহণের সঙ্গে যোগ্যতর অফিসারের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। পাণ্ডুলিপি গ্রহণ, প্রকাশনা ও মুদ্রণ ব্যবস্থা এবং বিতরণের ক্ষেত্রে যাতে কোন রকম অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও দুর্নীতি জড়িত না থাকে তা দেখার জন্য একটা বিশেষ সেল গঠনের প্রয়োজন। এদের দায়িত্ব হবে নির্দিষ্ট সময় গ্রন্থ প্রকাশ ও বিতরণে অব্যবস্থা দূরীকরণ। এই সেলের সঙ্গে যাতে কোন অর্থকরীর দিক জড়িত না থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ছাড়া স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে এই সেল কাজ করতে সক্ষম হবে না। তা ছাড়া, সংস্থার ভেতরে দুর্নীতি ঘটলে তার অবশ্যই প্রতিবিধান করতে হবে অপরাধ হিসেবে বিচারের মাধ্যমে।

পাঠ্যগ্রন্থ সংস্থা আর্থিক দিক থেকে অত্যন্ত ধনী। সংস্থার পক্ষ থেকে বিরাট আকারের প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করলে নিজেদের পক্ষে অধিকাংশ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হবে। সারাবছর প্রেস কর্মক্ষম থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থ প্রকাশ করে অনায়াসেই দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই বিতরণ করা সম্ভব হবে। প্রেসে ক্রমান্বয়ে একটি গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক বই মুদ্রণ করে বিভিন্ন শহরে পাঠালে বই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সংরক্ষিত প্লেটে অবশিষ্ট বই ছাপানো মোটেই কষ্টকর হবে না। এ ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের দূরবর্তী অঞ্চলে প্রথমে মুদ্রিত পাঠ্যগ্রন্থ পাঠিয়ে নিকটবর্তী শহরে পরবর্তী পর্যায়ে পাঠালে শিক্ষার্থীদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যবই পেতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

পাঠ্যগ্রন্থ সংস্থা নিজেরা স্কুলে শিক্ষাবর্ষের আগে বিভিন্ন পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশ ও বিতরণে অপারগ হলে এ ক্ষেত্রে দুটো ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। প্রথমত, সংস্থার পক্ষে যে ক'টা বই মুদ্রণ ও বিতরণ করা শক্তিসাধ্য, সেগুলোর ভার গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, অবশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশকদের ওপর মুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ছেড়ে দেয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে, প্রকাশকরা নিজেরা পাঠ্যপুস্তক তৈরি করে বিভিন্ন স্কুলে সরবরাহ করবে এবং বিভিন্ন স্কুল গ্রন্থের মান যাচাই করে নিজেদের শিক্ষার্থীদের জন্য তালিকাভুক্ত করবে।

গ্রন্থ সংস্থা নিজেদের জন্য নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে ইংরেজি, বাংলা, গণিত, তর্কশাস্ত্র, সমাজবিষয়ক গ্রন্থ ছাড়া সব শ্রেণীর র‍্যাপিড রিডার, নিজেদের জন্য রেখে বাকি পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশকদের ওপর ছেড়ে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ এনে গ্রন্থের মান মনিটরিং করার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হতে যে পারে না, তা নয়।

বর্তমানে পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশ ও বিতরণে এনসিটিবির পক্ষে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে তা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের হাতে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ তুলে দেয়ার দায়িত্ব তাদের— এই দিকটি মনে রেখে বাস্তব কার্যক্রমে তাদের অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : *কথাসাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক*